বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্যুযাত্রা

টেরি ইগলটন

অনুবাদ : কাজী তাফসিন ও মশিউর রহমান

বর্তমান সময়ে এসে বাংলাদেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের ঘোষিত নীতি থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে কিংবা এমন নীতি ঘোষণা করছে, যার সাথে 'বিশ্ববিদ্যালয়' নামক প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নেই। একদিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে প্রশাসনের জায়গায় ক্ষমতাসীনরা অস্ত্র-ভয় ও অর্থ-ক্ষমতা-লোভের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করছেন; ইনস্টিটিউট, অনুষদ ও বিভাগগুলো নিয়োজিত রয়েছে বাজারের প্রয়োজন অনুযায়ী জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানসৃষ্টির প্রশ্নটাকে সীমাবদ্ধ রাখার কাজে; অন্যদিকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলছে বাজারমুখী ডিগ্রিধারী কর্পোরেট ও তথাকথিত উদ্যোক্তা উৎপাদনের মহড়া। এসবের বলি হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অভ্যন্তরীণ 'সমস্যার' টোটকা দাওয়াই হিসেবে আবার নব্য-উদারনীতিবাদ অনুপ্রবেশ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাই হারিয়ে ফেলছে এর পূর্বের স্বায়ত্তশাসিত ব্যবস্থা এবং নিজ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা। এরকম অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় বলতে আমরা কী বুঝি কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-উপনিবেশায়ন বিষয়ক প্রশ্নটাও বাংলাদেশের একাডেমিক পরিসরে নতুনভাবে আলোচিত হচ্ছে (ভট্টাচার্য্য ২০১৮, নিজার ২০১৮)। যুক্তরাজ্যে টেরি ইগলটন যে বাস্তবতায় বসে এই বাক্যগুলো লিখছেন, তার সাথে বাংলাদেশের অবস্থার পুরোপুরি মিল না থাকলেও এখানকার চিত্র যে আরও ভয়াবহ সে বিষয়ে আমরা দুজনই একমত। সাম্প্রতিক সময়ে কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং ডাকসু নির্বাচনের সময়কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ক্ষমতাসীন বাহিনীর যে ভয়াবহ ও নির্দয় রূপ আমরা দেখেছি এবং এই সময় বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিগুলো যে নির্লজ্জ ভূমিকা পালন করেছে, তা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আশু ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত করেছে। তাই আমরা এই অনুবাদটি প্রকাশের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, যা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমাদের খানিকটা সচেতন করে তুলতে পারে।– অনুবাদকবৃন্দ

কয়েক বছর আগে এশিয়ার প্রযুক্তিগতভাবে ভয়াবহ রকম অগ্রসর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির সাথে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ, সুতরাং তাঁর দুপাশে ছিলেন বিশালদেহী দুজন কালো স্যুট আর চশমা পরা অস্ত্রধারী বডিগার্ড। খুবই উদ্যমী ভঙ্গিতে তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের বিষয়ে কথা বলছিলেন এবং চাইছিলেন, আমি যেন এর প্রশংসা করে কিছু একটা বলি। কিন্তু আমি উত্তরে বললাম, আমার মনে হচ্ছে এই ক্যাম্পাসে ক্রিটিক্যাল স্টাডিজের মত বিষয়ে কোন পড়াশোনাই করানো হয় না। তিনি তারপর এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন, যেন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গেল বছর পোল ড্যান্সিংয়ের ওপর কয়টা পিএইচডি দেয়া হয়েছে। তিনি বেশ নীরস ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন, "তোমার মতামতের বিষয়ে আমরা ভেবে দেখব।" তারপর তিনি পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে কোরিয়ান ভাষায় কাউকে কী যেন বললেন, যেটা সম্ভবত 'কিল হিম' (kill him) ধাঁচের কিছু একটা। এর পরপরই একটি ক্রিকেট পিচের সমান লম্বা লিমোজিন গাড়ি এল, যেটার ভেতরে মান্যবর সভাপতি প্রবেশ করলেন। আমি তাঁর গাড়ির অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটা দেখতে থাকলাম এবং ভাবতে থাকলাম কখন আমার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হচ্ছে।

এই ঘটনাটি দক্ষিণ কোরিয়ায় ঘটলেও এটা পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই ঘটতে পারে। কেপটাউন থেকে রিঁজাভিক, সিডনি থেকে সাও পাওলো–যে কোন জায়গায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের এরকম মৃত্যুযাত্রার আলোচনা কিউবা বিপ্লব বা ইরাকে মার্কিন আক্রমণের মতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ৮০০ বছরের ইতিহাস আছে, যেগুলো সব সময়ই জনবিচ্ছিন্ন ছিল বলে অভিযোগ করা হয়; এবং এই অভিযোগটিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেও উড়িয়ে দেয়া যায় না। এই ইতিবাচক বা নেতিবাচক জনবিচ্ছিন্নতার সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একটি নির্ধারিত সামাজিক উদ্দেশ্য, প্রয়োজন ও মূল্যবোধ অনুসারে নিজস্ব গণ্ডিতে এমনভাবে বেঁধে ফেলে যে তারা কোন আত্মসমালোচনারই সময় করতে পারে না। দুনিয়াজুড়েই এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে পুঁজিতান্ত্রিক নির্ভরতার চরিত্র দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ এই প্রতিষ্ঠানগুলোই একসময় ইরেসমাস থেকে জন মিল্টন, আইনস্টাইন থেকে মন্টি পাইথনের মত মানুষদের গড়ে তুলেছিল।

এইসব ঘটনা আমেরিকার অধ্যাপকদের কাছে বেশি পরিচিত হওয়ার কথা। স্ট্যানফোর্ড ও এমআইটি উদ্যোক্তা ধাঁচের বিশ্ববিদ্যালয় এর ভাল উদাহরণ। কিন্তু আমেরিকার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মত কোন অর্থনৈতিক ভিত্তি ছাড়াই ব্রিটেনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আমেরিকানাইজেশন হয়েছে।

এটা এমনকি অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের মত ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রেও সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যে প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন ধরে বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থের বাইরে দাঁড়িয়ে কাজ করে যাচ্ছিল। কয়েক বছর আগে আমি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি চেয়ার থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিলাম (যেটা এডিনবরায় ভূমিকম্প হওয়ার মতই বিরল কোন ঘটনা), যখন আমি বুঝতে পারলাম যে একজন জ্ঞানসাধকের (scholar) চেয়ে একটি প্রাইভেট কম্পানির প্রধানের (CEO) মত আচরণ আশা করা হচ্ছিল আমার কাছ থেকে।

৩০ বছর আগে যখন আমি প্রথম অক্সফোর্ডে এসেছিলাম, তখন এ ধরনের অতিপেশাদারিকে তীব্র তাচ্ছিল্যের চোখে দেখা হত। আমার সহকর্মীদের মধ্যে যাঁরা পিএইচডি শেষ করেছিলেন তাঁরাও নামের আগে 'ডক্টর' না লিখে 'মিস্টার' লিখতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না পিএইচডি করা একটি অমানুষিক পরিশ্রমের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। বই প্রকাশ করাকে একটি কুরুচিপূর্ণ কাজ হিসেবে গণ্য করা হত। বরং প্রতি দশ বছর অন্তর পর্তুগিজ ভাষার বাক্যতত্ত্ব কিংবা প্রাচীন কার্থেজিয়ানদের ডায়েট বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করাটাই ছিল স্বাভাবিক। এমন একটি সময় ছিল, যখন অধ্যাপকরা ক্লাসের সময়সূচি নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন না। বরং শিক্ষার্থীরা সাধারণতই নিজ উদ্যোগে শিক্ষকদের রুমে যেত–সেটা হোক এক গ্লাস শেরি পান করার জন্য বা জেন অস্টিনকে নিয়ে আলাপ

করার জন্য কিংবা অগ্ন্যাশয় কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য।

এখনও অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের কলেজগুলোতে পুরনো অনেক রীতিই টিকে আছে। অধ্যাপকরাই এখনও ঠিক করেন অর্জিত টাকা কোথায় কীভাবে ব্যয় করা হবে, বাগানে কোন্ ফুলের গাছ লাগানো হবে, কমনরুমের দেয়ালে কাদের ছবি টাঙানো থাকবে, এবং ব্যাখ্যা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়াইনের দোকানে কী কারণে লাইব্রেরির তুলনায় বেশি খরচ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ফেলোরাই সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং সমস্ত অর্থনৈতিক ও একাডেমিক বিষয়ে অধ্যাপকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়, যারা ফেলোদের কাছে জবাবদিহি করে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রশংসনীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমাগত কেন্দ্রীকরণের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যেটা আমাকে এই জায়গা থেকে বের করে এনেছে (যদিও কেন্দ্রীকরণের এই প্রবণতা আরও শক্তিশালী হচ্ছে)। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের কলেজগুলো প্রাক-আধুনিক সময়ের প্রতিষ্ঠান হলেও, এবং নানা রকম সুযোগ-সুবিধার মধ্যে থাকলেও তাদের নিজেদের সম্পর্কে এই আত্মবিশ্বাস নেই যে তারা বিকেন্দ্রীকৃত (decentralized) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভাল উদাহরণ হতে পারে।

ব্রিটেনের অন্যান্য জায়গায় পরিস্থিতি একদমই আলাদা। সেখানে গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠন না করে তারা বরং বাইজেন্টাইন ব্যুরোক্রেসির আদলে এক ধরনের ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যেখানে জুনিয়র অধ্যাপকরাই সমস্ত কাজ করেন, এবং উপাচার্য গাড়ির কারখানা পরিচালনা করছেন– এরকম একটা ভাব নিয়ে থাকেন। সিনিয়র অধ্যাপকরা হয়ে গেছেন সিনিয়র ম্যানেজার, এবং তাঁদের চারপাশের বাতাস সব সময় নানা রকমের হিসাব-নিকাশের আলাপে ভারী থাকে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐতিহাসিক বিষয়াবলি নিয়ে লেখা বইগুলোকে ক্রমাগত অজনপ্রিয় করে তোলা হচ্ছে। অন্তত একটি ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা জানা যায়, যেখানে অধ্যাপকদের রুমে বুকশেলফের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে 'ব্যক্তিগত পাঠাগার' গড়ে তোলার প্রবণতাকে নিরুৎসাহ করার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লেখালেখির গুরুত্ব কমিয়ে ফেলা হয়েছে এবং এখন অধ্যাপকদের রুমে কাগজ ফেলার ঝুড়ি থাকাটা 'টি পার্টি ইন্টেলেকচুয়াল'দের মতই বিরল বিষয়।

সাম্প্রতিক ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'গবেষণা' 'অধ্যাপনা'র চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ 'গবেষণা'র মাধ্যমে এক্সপ্রেশনিজম বা রিফর্মেশনের ওপর কোর্স করানোর চেয়ে বেশি অর্থ উপার্জন করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বর্তমান অশৈল্পিক প্রশাসন বর্বর ও অর্ধশিক্ষিতের গদ্যে রচিত নির্দেশাবলি দিয়ে ক্যাম্পাস ভরিয়ে ফেলেছে। উত্তর আয়ারল্যান্ডের একজন উপাচার্য হোমরাচোমরাদের আপ্যায়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালটির একমাত্র কমনরুম, যেটা ছাত্র ও স্টাফদের একমাত্র কমনরুম ছিল, সেটাকে একটা প্রাইভেট ডাইনিংরুমে পরিণত করেছেন। ছাত্ররা যখন প্রতিবাদে রুমটি পুনর্দখল করে তখন তিনি তাঁর সিকিউরিটির লোকদের একমাত্র রেস্টরুমটিও ভেঙে ফেলার জন্য নির্দেশ দেন। ব্রিটিশ উপাচার্যরা দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ধ্বংস করে আসছিলেন, কিন্তু এরকম জঘন্য ঘটনা সত্যি বিরল। ওই একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সিকিউরিটির লোকেরা রাস্তায় চলাচলকারী ছাত্রদেরও সরিয়ে দিচ্ছিল। এই বিশ্রী ও অসভ্য লোকদের থেকে মুক্ত হলেই কেবল একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে পারে।

এইসব অধঃপতনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যা ঘটেছে তা হচ্ছে, মানবিকীবিদ্যার বিষয়সমূহ একেবারেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ সরকার চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে টাকা-পয়সা দিলেও মানবিকীবিদ্যার জন্য টাকা-পয়সা দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই অবস্থার যদি কোন পরিবর্তন না হয় তাহলে অচিরেই মানবিকীবিদ্যার বিভাগসমূহ বন্ধ হয়ে যাবে। যদি ইংরেজি বিভাগ কোনভাবে টিকেও যায়, তাহলেও সেটা টিকবে বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের সেমিকোলনের ব্যবহার শেখানোর জন্য, যেটা হয়তো নরথ্রপ ফ্রে বা নিওলেন ট্রিলিং কখনও ভাবতেই পারেননি।

মানবিকীবিদ্যার বিভাগসমূহ বর্তমানে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থের দ্বারাই নিজেদের পরিচালিত করছে, যার অর্থ হচ্ছে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান, যেগুলো সম্পূর্ণ এই ব্যবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে, তারা গোপনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে গেছে। ব্রিটেন দীর্ঘদিন ধরে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রতিরোধ করে এলেও এখন এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গড়ে ওঠার মতো পরিবেশ গড়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের সরকার অনেক বেশি পরিমাণে টিউশন ফি বাড়িয়েছে, যার ফলে শিক্ষার্থীরা, যারা ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে পড়ছে, তারা যথার্থভাবেই পড়ালেখার উচ্চমান এবং অধিক ব্যক্তিগত মনোযোগ প্রত্যাশা করছে, এবং অন্যদিকে মানবিকীবিদ্যার বিভাগগুলো প্রবল অর্থসংকটে ভুগছে।

এইসব অধঃপতনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যা ঘটেছে তা হচ্ছে, মানবিকীবিদ্যার বিষয়সমূহ একেবারেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

এর সাথে সাথে ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 'অধ্যাপনা'র চেয়ে 'গবেষণা' বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ পড়ানোর চেয়ে 'গবেষণা'ই অধিক অর্থকরী। কয়েক বছর পর পর ব্রিটিশ সরকার বিশ্ববিদ্যালগুলোতে ব্যাপক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে, যার মাধ্যমে তারা প্রতিটি বিভাগের গবেষণাকাজের ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করে। এর ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে সরকারি বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যাপনার জন্য যথেষ্ট প্রণোদনা না থাকায় এবং বাজারি ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার জন্য যথেষ্ট 'কারণ' থাকায় অধ্যাপকরা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় আর্টিকেল, অনাবশ্যক অনলাইন জার্নাল প্রকাশ করা, মনোযোগ সহকারে অপ্রয়োজনীয় রিসার্চ ফান্ডের জন্য আবেদন করা এবং নিজেদের সিভি লেখার জন্য অস্বাভাবিক আনন্দের মধ্যে সময় কাটানোতে ব্যস্ত থাকছেন।

যেভাবেই হোক ব্রিটিশ উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ম্যানেজারিয়াল মতাদর্শের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের বিকাশ ঘটায় এবং অবিরাম রাষ্ট্রীয় তদারকির মধ্যে থাকায় অধ্যাপকরা জরুরি হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারেন না, যেটা কয়েক বছর ধরে বেশি পরিমাণে ঘটছে। রাষ্ট্রীয় পরিদর্শকরা সাধারণত ফুটনোটে গিজগিজ করা আর্টিকেলগুলোকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, কিন্তু শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকদের জন্য রচিত সর্বোচ্চ বিক্রীত পাঠ্যবইও অবহেলিত হয়। অধ্যাপকরা এ কারণে অধ্যাপনার চেয়ে সাময়িক ছুটি নিয়ে তাঁদের গবেষণাকাজ অগ্রসর করার মাধ্যমেই তাঁদের প্রতিষ্ঠানের সুনাম বাড়ানোর কাজে সচেষ্ট থাকেন।

অধ্যাপকগণ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা বাড়ানোর জন্য একাডেমিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে সার্কাসে যোগ দিতে পারেন, অতঃপর তাঁদের অধিকতর অনিচ্ছুক মনিবের কাছ থেকে বেতন নিশ্চিত করতে

পারেন এবং আমলাদের মাধ্যমে তাঁদের কাজ ইতোমধ্যেই ভারাক্রান্ত অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। ব্রিটেনের অনেক অধ্যাপকই জানেন তাঁরা ফিরে এলে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কী ভীষণ খুশি হবে, কারণ কিছু রাশভারি বাড়ির নামের পাশাপাশি তাঁদের মাধ্যমেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরও অনেক বেশি পরিমাণে ক্রেতা আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে। বর্তমান সময়ে ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অগ্রিম অবসরে যাওয়ার মত অধ্যাপকের কোন ঘাটতি নেই, যদিও ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একসময় কাজ করার জন্য খুবই উপযুক্ত জায়গা হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিল, এবং এখন যেগুলোতে কাজ করার জন্য প্রচণ্ড অস্বস্তিকর পরিবেশের বিষয়ে এখানকার বেশির ভাগ চাকরিজীবীই একমত। অধিকন্তু ছুরির আরেকটি মোচড়ের মত তাঁদের পেনশন বরাদ্দও কমিয়ে দেয়া হয়েছে।

অধ্যাপকরা যেহেতু পরিণত হয়েছেন ম্যানেজারে, সেহেতু শিক্ষার্থীরা পরিণত হয়েছে ক্রেতায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরস্পরের মধ্যে অসুস্থ, অমর্যাদাকর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফি আদায় নিশ্চিত করার জন্য। যখনই একজন শিক্ষার্থীরূপী ক্রেতা এরকম একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করছে, তার পরই অধ্যাপকদের ওপর চাপ আসতে থাকে তাকে অকৃতকার্য না করার জন্য, কেননা তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় অনেকগুলো ফি হারাবে। বিষয়টা এমন যে একজনের অকৃতকার্য হওয়ার দায় হচ্ছে অধ্যাপকের, যেমন হাসপাতালগুলোতে রোগীর মৃত্যুর দায় দেয়া হয় ডাক্তারদের। শিক্ষার্থীদের টাকার থলের দিকে এরকম লোভাতুর দৃষ্টির কারণে সংক্ষিপ্ত ও সহজ কোর্সগুলো তৈরি করা হচ্ছে, যেগুলো আবার ২০ বছর বয়সীদের মধ্যে জনপ্রিয়। আমি যে বিভাগে কাজ করি, সেই ইংরেজি বিভাগও ভিক্টোরিয়ান যুগের চেয়ে ভ্যাম্পায়ার, শেলির চেয়ে সেক্সুয়ালিটি, ফুকো অপেক্ষা ফ্রেঞ্জাইন্স, মধ্যযুগের চেয়ে আধুনিক যুগ বিষয়ক কোর্স পড়ানোর ক্ষেত্রে বেশি আগ্রহী। বিষয়টি এমন যে অন্তরালে থাকা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিই ঠিক করে দিতে আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ে কী পড়ানো হবে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ যদি এর মধ্যে অ্যাংলো-স্যাক্সন সাহিত্য বা অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের প্রতি অধিক মনোনিবেশ করে তাহলে সে বর্তমান পরিস্থিতিতে কেবল নিজেই নিজের মৃত্যু ডেকে আনছে।

> বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যাপনার জন্য যথেষ্ট প্রণোদনা না থাকায় এবং বাজারি ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার জন্য যথেষ্ট 'কারণ' থাকায় অধ্যাপকরা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় আর্টিকেল, অনাবশ্যক অনলাইন জার্নাল প্রকাশ করা, মনোযোগ সহকারে অপ্রয়োজনীয় রিসার্চ ফান্ডের জন্য আবেদন করা এবং নিজেদের সিভি লেখার জন্য অস্বাভাবিক আনন্দের মধ্যে সময় কাটানোতে ব্যস্ত থাকছেন।

অধিক ফি আদায়ের জন্য তৃষ্ণার্ত ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালগুলো এখন শিক্ষার্থীদের বিশেষত্বহীন (undistinguished) স্নাতক সনদ দিচ্ছে, যাতে শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারে, এবং এই সময়েই অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীরা (যারা প্রচুর পরিমাণে অযৌক্তিক ফি দিতে বাধ্য হয়) ভাষাটা ভালোভাবে শেখা ছাড়াই হয়ত ডক্টরেট করতে শুরু করে দেয়। দীর্ঘদিন যাবৎ ক্রিয়েটিভ রাইটিংয়ের ওপর আমেরিকান কোর্সগুলোকে জঘন্য বলে এলেও ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইংরেজি বিভাগসমূহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আগ্রহী ও সম্ভাবনাময়দের আকর্ষণ করার জন্য ইদানীং মাঝারি মানের ঔপন্যাসিক বা ব্যর্থ কবিদের ভাড়া করতে শুরু করেছে। এসবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতারণামূলকভাবে বিপুল ফি আদায় করা হচ্ছে এবং এখান থেকে প্রাপ্ত এইসব বিশ্রী জ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কাফকার মত একদিন ভোরবেলা উঠে নিজেকে একটি পোকায় রূপান্তরিত হয়ে যেতে দেখার উপলব্ধির থেকে নিজেদের প্রথম উপন্যাস বা প্রথম কবিতার বইয়ের প্রকাশক পাওয়ার নিশ্চয়তা পেয়ে থাকে।

শিক্ষা অবশ্যই সমাজের প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া উচিত। কিন্তু বিষয়টি মোটেই এমন নয় যে এর মাধ্যমে আপনি নিজেকে নব্যপুঁজিতান্ত্রিকতার একজন দাস মনে করবেন। বরং আপনি সমাজের প্রয়োজনের প্রতি আপনার দায়িত্ব কার্যকরভাবে পালন করতে পারেন এই চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন (alienated) শিক্ষাব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে। মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমাজকে বৃহত্তর অর্থে ভালভাবে সহযোগিতা করেছিল, কিন্তু তারা এটা করেছিল ধর্মযাজক, আইনবিদ, ধর্মতাত্ত্বিক এবং প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় লোকদের তৈরি করার মাধ্যমে, যাঁরা গির্জা ও রাষ্ট্রকে টিকে থাকতে সহযোগিতা করেছিলেন; এবং যেটা তাঁরা করেছিলেন অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় কোন রকম বাধা সৃষ্টি করা ছাড়াই।

যাই হোক, এখন সময় বদলে গেছে। ব্রিটেনের আইন অনুসারে রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে করা যে কোন গবেষণাকাজই এখন নিজেকে তথাকথিত জ্ঞান-অর্থনীতির অংশ মনে করবে এবং ভাববে সমাজের ওপর তার গভীর প্রভাব রয়েছে। সমাজের ওপর এ ধরনের প্রভাব এখন প্রাচীন ইতিহাসের ওপর বিশেষজ্ঞদের অপেক্ষা বিমান চালনা সংক্রান্ত প্রকৌশলীদের পক্ষে কল্পনা করা অধিকতর সহজ। ফার্মাসিস্টরা এই খেলায় ফেনোমেনোলজিস্টদের থেকে অনেক বেশি অগ্রসর। যেসব বিষয় বর্তমান সময়ে লাভজনক গবেষণা সহায়তার জন্য প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে আকর্ষণ করতে পারে না কিংবা যারা বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থীকে টানতে পারে না, তারা একটি ধারাবাহিক সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে মেধা বিচার করা হচ্ছে টাকা উপার্জনের যোগ্যতার দ্বারা এবং একজন জ্ঞানী শিক্ষার্থী হচ্ছে সেই, যে চাকরি পাওয়ার যোগ্য। প্রাচীন লিপিবিদ্যা কিংবা প্রাচীন মুদ্রা সংক্রান্ত বিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য এই সময়টা সত্যি ভাল নয়, এবং জ্ঞানের এসব শাখার নাম ও বানানই আমরা কিছুদিন পরে ভুলে যাব, যদি না আমরা ব্যক্তিগতভাবে এগুলোর চর্চা করে থাকি।

মানবিকীবিদ্যাকে কোণঠাসা করে দেয়ার প্রভাব মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতেও এখন অনুভূত হচ্ছে, যেখানে আধুনিক ভাষা শিক্ষা ক্রমাগত অজরুরি হয়ে পড়ছে, ইতিহাস বলতে যেখানে কেবল আধুনিক ইতিহাস বোঝানো হচ্ছে, এবং ক্লাসিক সাহিত্য পড়ানোটা কেবল ইটন কলেজের মত কিছু প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। (এ কারণেই সম্ভবত ইটনের প্রাক্তন ছাত্র, লন্ডনের মেয়র বরিস জনসন তাঁর ঘোষণাপত্রগুলোতে হোরাসকে উদ্ধৃত করে থাকেন।)

এটাও সত্য যে দার্শনিকরা চাইলেই রাস্তার ধারে বসে মানুষজনকে জীবনের আসল মর্ম বোঝানোর জন্য একটা ক্লিনিকের ব্যবসা খুলতেই পারেন, ভাষাতাত্ত্বিকরা পাবলিক প্লেসে প্রয়োজন মোতাবেক অনুবাদের স্টেশনের মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। মূল বিষয়টি হচ্ছে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার বাহানায়, মোটা দাগে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হচ্ছে উদ্যোক্তা বানানোর একেকটা কারখানায়। সাম্প্রতিক একটি সরকারি রিপোর্টে ভীষণ উদ্যমের সাথে বলা হচ্ছিল, এগুলো যেন 'পরামর্শদাতা

সংস্থা' হিসেবে কাজ করে, যেটা খুবই হতাশাজনক। এখন কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলো পরিণত হয়েছে একেকটা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাজ হচ্ছে তাদের স্বচালিত হোটেলের কিংবা ক্যাটারিংয়ের ব্যবসা করা; অথবা কনসার্ট ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা, এবং আরও কত কী!

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রভাবই মূলত ব্রিটেনের মানবিকীবিদ্যার বিভাগগুলোর দুর্দশার জন্য দায়ী। (আমেরিকার তুলনায় ব্রিটেনের দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চশিক্ষা খাতে তেমন প্রভাব রাখতে পারে না, যেহেতু আমেরিকার বসবাসরত কোটিপতির সংখ্যা অনেক বেশি।) এর পাশাপাশি, আমরা এমন একটি সমাজ চাই, যেখানে আমেরিকার মত করে শিক্ষাকে ভোগ্যপণ্যের মত ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয় হিসেবে তুলনা করা হবে না। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই মনে করে, স্কটল্যান্ডের আদলে উচ্চশিক্ষার সুযোগ হওয়া উচিত পুরোপুরি বিনা মূল্যে; এর পেছনে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিস্বার্থ কাজ করলেও এটা খুবই ন্যায্য দাবি। সিরিয়াল কিলারদের হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই তরুণদের শিক্ষিত করা উচিত, মুনাফার উদ্দেশ্যে নয়।

আমি নিজেও সরকারিভাবে দেয়া বৃত্তির টাকার ওপর সাতটা বছর কাটিয়েছি এর বিনিময়ে কাউকে কোন কিছু না দিয়েই। তাই এটা সত্য যে ক্রীতদাসের মত সব সময় রাষ্ট্রের ওপর এভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকার কারণেই আজ নীতিগতভাবে আমার এই অবনতি হয়েছে এবং আমি মেরুদণ্ডহীন একটা প্রাণীতে পরিণত হয়েছি; আজ আমার না আছে সবার সামনে নিজের চেহারাটুকু দেখানোর সৎসাহস, না আছে একটা বন্দুক হাতে আমার পরিবারকে রক্ষা করার ন্যূনতম যোগ্যতাটুকু। রাষ্ট্রের প্রতি আমার এই নির্লজ্জ পরনির্ভরশীলতার কারণেই কিছুদিন পর পর আমাকে (সরকারি!) ফায়ার সার্ভিসে কল দিতে হয়, যেন ওরা এসে আমার কলমে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনটুকু পর্যন্ত নিভিয়ে দেয়। তাই ভাবছি, ওই সাত বছরে নিজের মধ্যে লেখালেখির যে ভয়াবহ স্বাধীনতাটুকু এসেছিল, তা কিভাবে অন্য কারো কাছে বিক্রি করা যায়।

এটা সত্য যে আমাদের সময়ে ব্রিটেনে মাত্র ৫ শতাংশ মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেত, আর এখন অনেকেই বলে যে এই হার বেড়ে ৫০ শতাংশে এসে ঠেকেছে প্রায়, কিন্তু আগের চেয়ে কোন দিকেই এর উজ্জ্বলতা বাড়েনি। যদিও জার্মানি এখানে একটা উদাহরণ হয়ে থাকতে পারে, যেখানে তাদের নির্দিষ্টসংখ্যক শিক্ষার্থী এই সুবিধা ভোগ করতে পারে। কোন ব্রিটিশ সরকার যদি ছাত্রদের মাথার ওপর থেকে ঋণের বোঝা নামানোর জন্য আন্তরিক হত তাহলে তারা সেটা অনায়াসেই করতে পারত অস্বাভাবিকভাবে ধনীদের ওপর আরও অধিক কর আরোপ করে এবং বিপুল পরিমাণ কর ফাঁকির একটা ফয়সালা করে।

এবং এটা করার সাথে সাথে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমীহ করার মতো ঐতিহ্য রয়েছে সেটা পুনরুদ্ধার করতে চাইতে পারত, যার মত এত দীর্ঘ সামাজিক ঐতিহ্য খুব কম কিছুরই আছে (আরেকটি হচ্ছে শিল্প), যার কাছে কর্তৃত্বকারী আদর্শগুলো অনায়াসেই বশ্যতা স্বীকার করে থাকে। কিন্তু তারা ইদানীং মানবিকীবিদ্যার ওপর এখন যেসব কথা বলে জোর দেয়ার ভান করে থাকে, সত্যি সত্যি কি মানবিকীবিদ্যা সেইসব কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ? সমাজের ঐক্য রক্ষা করাটা কখনোই মানবিকীবিদ্যার প্রধান কাজ নয়। প্রাক-আধুনিক সময়ে শিল্পীরা বর্তমান সময়ের শিল্পীদের চেয়ে অনেক বেশি সমাজের সাথে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু অনেক সময়ই এই ঐক্যের অর্থ ছিল কোন আদর্শবাদের অন্ধ সমর্থক হওয়া, কোন রাজনৈতিক শক্তির দালালি করা বা রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করা। কিন্তু আধুনিক শিল্পীদের সাধারণভাবে সমাজে এরকম কোন বিশেষ স্থান নেই এবং তাঁরাও তাঁদেরকে দেয়া কোন বিশেষ মর্যাদা এমনি এমনি মেনে নিতে রাজি নন।

যাই হোক, আপাতত নতুন একটা ব্যবস্থা আসার আগ পর্যন্ত, আমি আমার এই সংকীর্ণমনা কথাবার্তাগুলো আর মূল্যবোধ শেখানোর এই নির্বোধ দায়িত্বগুলোকে নিজের মনের মধ্যে চেপে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি লজ্জিত হই, যখন নতুন সেশনে ভর্তি হওয়া স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের আমি বলি, হয় তোমাদেরকে আমার এইসব অসাধারণ সাহিত্য-সমালোচনার আলাপ শোনার জন্য টাকা দিতে হবে, না হলে তোমাদের নিজেদেরই কার্যকর কিন্তু একটু কম ক্ষুরধার সমালোচনা লিখতে হবে।

চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিনিময় করে টাকা আদায় করা প্রচন্ড বিরক্তিকর কাজ, আর এটা শিক্ষার্থীদের সাথে আন্তরিক সম্পর্কের জায়গা একেবারেই নষ্ট করে দেয়; কিন্তু এখনকার সময়ের একাডেমিক পরিবেশে এছাড়া আর কী করা যেতে পারে তা আমার জানা নেই। এখন যাঁরা ভাবছেন যে এসব বলে আমি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করছি, তাঁদের জন্য আমার প্রস্তাব হল, যাঁরা আমার ওইসব মহামূল্য চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ক্যাশ টাকা দিতে পারবেন না তাঁদের সাথে প্রাচীন বিনিময় প্রথায় লেনদেন করতেও আমার কোন সমস্যা নেই। ধরুন টাকা না দিয়ে আমাকে আপনি দিতে পারেন আপনার বাসায় বানানো পাই, বাসায় তৈরি করা কয়েক বোতল বিয়ার, হাতে বোনা সোয়েটার কিংবা হাতে বানানো এক জোড়া জুতা। জীবনে তো টাকা ছাড়াও অনেক অনেক কিছু আছে, তাই না?

> অধ্যাপকরা যেহেতু পরিণত হয়েছেন ম্যানেজারে, সেহেতু শিক্ষার্থীরা পরিণত হয়েছে ক্রেতায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরস্পরের মধ্যে অসুস্থ, অমর্যাদাকর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফি আদায় নিশ্চিত করার জন্য। যখনই একজন শিক্ষার্থীরূপী ক্রেতা এরকম একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করছে, তার পরই অধ্যাপকদের ওপর চাপ আসতে থাকে তাকে অকৃতকার্য না করার জন্য, কেননা তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় অনেকগুলো ফি হারাবে।

(ইংরেজিতে মূল লেখাটির জন্য দেখুন : https://www.chronicle.com/article/The-Slow-Death-of-the/228991/
অনুবাদটি anthropologyjournal.net ওয়েবসাইটে প্রকাশিত)

অনুবাদকদের তথ্যসূত্র:

নিজার, সৈয়দ (২০১৮) *বিশ্ববিদ্যালয় : উদ্ভব, বিকাশ এবং বি-উপনিবেশায়ন*, ঢাকা, প্রকৃতি-পরিচয়।

ভট্টাচার্য্য, শিশির (২০১৮) *বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস : আদিপর্ব*, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন।

টেরি ইগলটন: সাহিত্য সমালোচক, রাজনীতি বিশ্লেষক ও মার্কসবাদী তাত্ত্বিক।

মশিউর রহমান: ইউল্যাবের শিক্ষার্থী।
ইমেইল: mashiur.1001@gmail.com
কাজী তাফসিন: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।
ইমেইল: kazitafsin@gmail.com